# ?? ??????? ???????

তরী রিক্সা ছেড়ে দিয়ে ফুটপাত দিয়ে হাঁটছিলো।আর একটু সামনেই ওদের বাড়ি।অন্য কেউ হলে, হয়ত এখানে খামোখা রিক্সা ছেড়ে দিতো না।আজ সারাটা দিন তরীর খুব ভাল কেটেছে।ঠিক যেমনটা সে চেয়েছিলো।তরী বজলুর রহমান সাহেবের একমাত্র মেয়ে।তরীর বয়স যখন মাত্র পাঁচ, তরীর মা আদর রহমান এই ভুবনের মায়া ছেড়ে পাড়ি জমালেন মেঘেদের দেশে।

মা – বাবা দুজনের আদর দিয়ে বজলুর রহমান সাহেব মেয়েকে বড় করেছেন।কিছু সময়ে পেরেছেন আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত পুরোপুরি পারেন নি।একজন বাবা কি সত্যিই পারে, মায়ের শূণ্যতা পূরণ করতে ?!
তবে, তরীর কোন আবদার তিনি অপূর্ণ রাখেন নি।তবে, গতপরশু মেয়ের অদ্ভুত ইচ্ছেটা তাকে খানিকটা বিস্মিত করলো।তরী তার জীবনে মোট কতবার রিক্সাতে উঠেছে, তা হাতে গুণে প্রথমে বজলুর সাহেবকে বলতে শুরু করলো।তাছাড়া প্রতিদিন ইউনিভার্সিটিতে যাবার সময় ড্রাইভার মজনু মিয়ার বকবকানিতে, সে রীতিমতো অস্হির হয়ে পড়ে।তার দৃষ্টিতে, তরী এখনো হয়ত দশ কিংবা বারো বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে।তাই, সব কথায় তাকে অহেতুক জ্ঞান বন্টনের অপচেষ্টা ইদানিং সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।অথচ, প্রতিদিন রিক্সায় যাওয়া গেলে, দিনগুলো কি এমন বৈচিত্র্যহীন হতো !

সকালের ঝলমলে রোদ অথবা, ফুটপাতের পথচারীদেরও একটু কাছের কেও বলে মনে হতো।সত্যিই কি মনে হতো ! কাছের মনে না হলেও, দূরের মানুষ হয়ে তারা হয়ত থাকতো না।তরী নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়ে যাচ্ছিলো।গাড়ির স্বচ্ছ জানালাটা যেন চিরচেনা এই শহরটাকে তার কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে চায়।বজলুর সাহেবের মেয়ের কথা শুনে হাসি পেল।যদিও, তিনি তা একদমই মেয়েকে বুঝতে দিলেন না।টেবিলে রাখা চশমাটা হাতে নিয়ে, রুমাল দিয়ে গ্লাসটা মুছে নিলেন।
তরীর কথা শুনলে আসলেই যে কারো মনে হবে- মেয়েটা এখনো ছোটই রয়ে গেছে।একটু বেশি নিজের কল্পনার জগতে থাকতে ভালবাসে।অথচ, তরীর এমন আচরণের পেছনে যে কিছুটা তার নিজেরও ভূমিকা রয়েছে ; সে ব্যাপারে বজলুর সাহেব বোধহয় অনবগত।

বাবার অনুমতি নিয়ে তরী আজ সারাটাদিন রিক্সা নিয়ে ঘুরেছে।সাথে ছিল প্রিয় বন্ধু অরণ্য।যদিও, অরণ্যের আজ সারাদিন তরীর মতো করে প্রফুল্ল আমেজে কাটেনি।নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে অরণ্য।
বাস কিংবা রিক্সায় এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করা, তার কাছে আর দশটা দিনের থেকে ভিন্ন কিছু নয়।তারওপর, তরীর পাগলামোর কারণে তাকে ক্লাসটাও মিস দিতে হলো।মিথিলা হয়ত কাল ওর দাদাবাড়ি খুলনায় যাবে।এরপর ওর সাথে এক সপ্তাহ দেখা হবার সুযোগ মিলবে না অরণ্যের। জ্বালাতনের জন্য এই দিনটা বরাদ্দ রাখার কি দরকার ছিল তরীর !
পাশাপাশি রিক্সায় অনেকটা সময় দুজনে বসে থাকলেও নীরবতার মোচন ঘটলো না।গোধূলির মায়ায় তরীর মনটা মেঘের মতোই ভেসে বেড়াচ্ছিলো।
একটুপর অবশ্য তার গোমরা মুখো অরণ্যের দিকে নজর পড়লো।

– আপনি কি পিন পতন নীরবতা ভাঙ্গিয়ে কিছু বলবেন, স্যার ?

বেখেয়ালি অরণ্য ডুবে ছিলো মিথিলার ভাবনাতে।তাই তরীর কথাগুলো তার কর্ণকুহরে পৌঁছাতে সক্ষম হলো না।তরী আঙ্গুল দিয়ে আলতো করে টোকা দিলো অরণ্যের কপালে।

– এভাবে মুখ গোমরা করে না থেকে, তোর মিথিলাকে এতদিনেও মনের কথাটা বলছিস না কেন !?

অরণ্যের চোখে বিরক্তি।

– সবসময় ওকে ' তোর মিথিলা ' বলে সম্বোধন করবি না, তরী।মেয়েটার নাম মিথিলা, তোর মিথিলা নয়।

মিথিলা ওমনি অরণ্যের কাঁধ চাপড়ে ধরে বললো,

– এই শোন, আমার সাথে একদম মেজাজ দেখাবি না।

– তোর হাত – পা ছোড়াছুড়ির অভ্যেসটা কবে যাবে !

তরী আদরের ভঙ্গিতে অরণ্যের গালটা টিপে ধরলো।

– ছাড়, ঢং দেখাবি না।

– আহারে ! আজ মনে হয়, সকাল থেকেই তোর মনটা মিথিলার কাছেই পড়ে ছিলো।আসলে ভুলটা আমারই।কেন যে বুঝতে পারলাম না ! এখন তোর ছুটি।তুই বাড়ি চলে যা, কাল দেখা হবে।

অরণ্য তাতেও রাজি হলো না।ধানমন্ডির গলিগুলো এ সময়টায় মাঝেমধ্যে বেশ নিরিবিলি থাকে।তাছাড়া তরী এমনিতেও একা চলাচল করতে অভ্যস্ত নয়।

মজনুমিয়া বিরক্তিকর হলেও, বিশ্বস্ত লোক।তাই আগের ড্রাইভারদের কিছুদিন পর পর বদলানো হলেও,মজনুমিয়ার ক্ষেত্রে তরীর বাবাকে সেকথা ভাবতে হয়নি।আর, তরীকে এভাবে রেখে সে নিজেও নিশ্চিন্তে বাড়িতে যেতে পারবে না।অরণ্যের আপত্তির কারণ জেনে তরীর হাসি পেল।

– আমি ছোটবেলা থেকে এখানে আছি অরণ্য।আর একটা গলি পরে আমাদের বাড়ি।কি এমন হবে ! এইটুকু সময় আমাকে প্রকৃতির সাথে একটু একা কাটাতে দে, প্লিজ।

অরণ্য হা-সূচক মাথা নাড়ালো।

– তোর পাগলামো আর গেল না।আচ্ছা, আমি গেলাম।

তরী একাকি হাঁটছে, এলোপাথাড়ি হাঁটা।উদ্দেশ্যহীন ভাবলেশ হাঁটাও বলা যেতে পারে।ওদের বাড়ির গলিটা ছেড়ে, পাশের একটা গলিতে ফুটপাত ধরে হাঁটছিল।একটু সামনে যেতেই দেখলো, অনেকগুলো গোলাপি রঙের কাঠগোলাপ পড়ে আছে।তরী দুটো ফুল কুড়িয়ে নিলো।পাশেই কাঠগোলাপ গাছটা।এতক্ষণ হাঁটার পর তৃষ্ণার্ত তরী গাছটার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।হঠাৎ পেছন থেকে একটা ছেলে কোন কিছু না বলেই, তরীর হাতের ব্যাগটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে সামনে দৌড় দিলো।তরীর চিৎকার শুনে কিছু লোক ছেলেটির পিছু নিলো।তরী নিজেও পেছন পেছন দৌড়াতে লাগলো।ছেলেটি ভয়ে ব্যাগটা অন্য একজনের হাতে ছুড়ে দিলেও, গণপিটুনি থেকে রেহাই পেল না।যে লোকটি তরীর ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তরী এবার তার দিকে এগিয়ে গেল।

– লজ্জা করে না, আপনাদের !

– আপনি ভুল করছেন।ওই দেখুন, আমার বড় ভাই ওখানে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছেন।উনি পেশায় একজন পুলিশ অফিসার।আমরা ভদ্র পরিবারের ছেলে।

– একদম চুপ, ফাজিল কোথাকার।

তরী তেড়ে এলো লোকটির দিকে।অপরদিকে যিনি ফোনালাপে ব্যস্ত ছিলেন, এবার তিনি তরীর আক্রমণাত্মক ভঙ্গি দেখে তড়িঘড়ি করে এগিয়ে এলেন।

– আরে আপু, করেন কি ! থামুন বলছি। শেষমেশ তিনি বোঝাতে সক্ষম হলেন তার এই চাচাতো ভাই নাভিদ অর্থ্যাৎ, তরী এতক্ষণ যাকে দ্বিতীয় ছিনতাইকারী রূপে প্রহারের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছিলো – সে একজন নিরপরাধ ব্যক্তি।

অপ্রত্যাশিত ঘটনার আকস্মিকতায় তরীকে বেশ ক্লান্ত লাগছিলো।বেচারি হুট করে ফুটপাতে বসে পড়লো।নাভিদ ধীর গতিতে একটু এগোলো।

– আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন ?

– আমি একটু পানি খাবো।

নাভিদ দৌড়ে পাশের দোকান থেকে পানি কিনে আনলো।মাঝে তার হাত থেকে সানগ্লাসটা পড়ে ফেটে গেল।যদিও সেদিকে তার একবারো নজর গেল না।

– চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেই।আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।

– আমি আসলে দুঃখিত।

– আমি নাভিদ।

– ও আচ্ছা, নাভিদ আমি খুব লজ্জিত আমার ব্যবহারের জন্য।

– রিক্সা ডেকে দেই একটা।

– না ঠিক আছে, আমি পারবো।

তরী একটা রিক্সা ডেকে উঠে পড়লো।নাভিদ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো, ওর বাসাটা কোন দিকে তা শোনার জন্য।অথচ, তরী এসব কিছু না বলে রিক্সাওয়ালাকে কেবল বললো,

– ভাই, চলুন।

রিক্সার গতি থেমে না থাকলেও, নাভিদের দৃষ্টি স্হির হয়েছিলো শুধু মেয়েটির দিকে।এক মায়া জাগানো প্রমত্ততা ছিল তার চোখে, যা স্তিমিত করে ছিলো নাভিদের চারপাশটা।কি নাম ছিল তার ? কেন সে জিজ্ঞেস করলো না ? কোথায় যাচ্ছিলো সে ? মেয়েটিকে সে কেন অনুসরণ করলো না ? প্রথম দেখাতেই কি কেউ কারো মনোহরণ করতে পারে ? তাও, আবার এমন পরিস্হিতিতে ! এ হয়ত ক্ষণিকের মোহ ছাড়া আর কিছুই নয় – এই বলে নাভিদ তার অশান্ত মনকে নিঃশব্দে চুপ করালো।

তরী বাড়িতে ঢুকে, বসার ঘরে দেখলো ফুপুকে।কিছু একটা সেলাই করছিলেন তিনি, শাড়ি অথবা ওড়না।হাতের কাজের অসাধারণ গুণ রয়েছে পারভিন রহমানের।রঙিন সুতাকে সুচের ছোঁয়ায় রাঙিয়ে তুলতে ভালবাসেন পরনের কাপড়গুলোকে।তরী অবশ্য এ ব্যাপারটায়, সম্পূর্ণরূপে তার উল্টো।সুচের সঙ্গী সুতো হলেও, তরীর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত ছিল দুটোই।

– আয় মা, কাছে আয়।

– না ফুপু, খুব ক্লান্ত লাগছে।গোসলটা সেরে একটা লম্বা ঘুম দেবো।তুমি আজ রাতে আছো তো ?

– হুম।

– আচ্ছা, আমি রুমে গেলাম।

দুদিন পরের কথা।তরী বাড়ি ফিরছিলো।মজনুমিয়া আজ ছুটিতে।ছোট ছেলেটাকে ডাক্তার দেখাতে হবে, সেকথা সকালে বলেছিলো বজলুর সাহেবকে।তরী ফেরার পথে, একদল ভেসে বেড়ানো মেঘ যেন তার পিছু নিলো।কিছু দূর যেতেই ছুঁয়ে দিলো তার লালশাড়িকে।তরীও যেন প্রেমোন্মত্ত হলো, তার সাথে আলিঙ্গনে।পেছন থেকে কে যেন বললো,

– এক্সকিউজ মি, এই ঠিকানাটা কোন দিকে একটু বলবেন ? আশেপাশে দেখেছি, কিন্ত বাড়ির নাম্বারটা মিলছে না।

তরী ভিজে থাকা টুকরো কাগজটা হাতে নিলো।কাগজে লেখা ঠিকানাটা ছিল ওদেরই বাড়ির।তরী এবার লোকটির দিকে তাকালো।তবে, আগে কখনো তাকে দেখেছে বলে মনে হলো না।একটু মুচকি হেসে, ভুলভাল দিকে পথ দেখিয়ে সে তাড়াতাড়ি চলে এলো।

তরী বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার প্রায় দেড় ঘন্টা পর দরজায় বেল বেজে উঠলো।পারভিন রহমান দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছিলেন, তরী হুট করে তাকে পেছনে ফেলে দরজাটা খুলে দিলো।কারণ, দরজার ওপাশে এখন কে আছে সেটা তার অজানা নয়।তবে, ওদিক থেকে বিস্ময়ে ভরা একজোড়া চোখে নির্বাক দৃষ্টি ছাড়া ; তার প্রতি আর কিছুই ছিল না।

ঠোঁটে দুষ্টুমি মাখা হাসি নিয়ে তরী জানতে চাইলো,

– কাকে চাই ?

– আমি বাবুই, ইন্টিরিয়র আর্কিটেক্ট।মিসেস পারভিন আমাকে আসতে বলেছিলেন।

তরী ফুপুকে ডাক দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

পারভিন রহমানের ছেলে সেলিম, জাপানে আছে গত আট বছর ধরে।মা আর ছোট বোন সেতুকে ঘিরে সেলিমের যত সুখ আর আনন্দ।পারভিন অনেক কষ্টে ছেলেকে বড় করেছেন।

স্বামি মৃত্যুর পর, দ্বিতীয় বিয়ের কথা কখনো সে ভাবেনি।সেলিম দেশের মাটি ছেড়ে যাবার পর, বজলুর সাহেব অনেকবার তার বোনকে বলেছেন এ বাড়িতে চলে আসবার জন্যে।পারভিন যদিও সপ্তাহে এ বাড়িতে দু-এক দিন থাকে, তবে এ বিষয়টিতে বরাবরই তার আপত্তি ছিল।সেলিম তার গত কয়েক বছরের উপার্জিত অর্থ তার মায়ের কাছে পাঠিয়েছে, দেখেশুনে একটা ভাল ফ্লাট কেনার জন্য।সেইসাথে, মনের মতো করে সাজাতে বলেছে নতুন ফ্লাটটিকে।এ জন্যেই বাবুইকে আজ আসতে বলা হয়েছিলো।

পারভিন বাবুইয়ের সাথে কথার ফাঁকে তরীকে একবার ডাক দিলেন।তরীকে বাবুইয়ের সাথে তিনি পরিচয় করাতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনি বাবুই বলে উঠলো

– আন্টি, আমি তো ওনাকে চিনি।

– চেনেন ! কিভাবে ?

– না মানে, একটু আগে রাস্তায় দেখা হয়েছিলো।

– মানে ??

বাবুই ঘটনাটা বলতে যাচ্ছিলো, ওমনি তরী বললো,

– আহ্ ! ফুপু, এত প্রশ্ন কেন যে করো তুমি !

– তুই বাবুইকে বলতে না দিলেও, আমি বুঝে নিয়েছি।তুই কি আর শুধরাবিনা তরী ?

পারভিন এবার বাবুইকে বললো,

– দেখুন, তরী যদি কোন দুর্ব্যবহার করে থাকে আপনার সাথে ; তার জন্য আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

– আন্টি, ইটস টোটালি ওকে।আর, আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন।

এভাবে কিছুদিন পরপরই তরী আর বাবুইয়ের দেখা হতো।বাবুই মানুষ হিসেবে তরীর সম্পূর্ণ বিপরীত।ধীর -স্হির শান্ত প্রকৃতির, কারো কথাতেই হুট করে রেগে যায় না।কিংবা, পাল্টা জবাব দিয়ে তাকে পরাজিতও করতে চায় না।আবার, সামান্য কথাতে তরীর মতো প্রাণ খুলে হাসতেও পারে না।তবে কেন জানি, তরীর কাছাকাছি থাকতে তার ভাল লাগে।মাঝেমধ্যে কোন কাজের বাহানা নিয়ে পারভিন রহমানের সাথে দেখা করার সময় তরীর সাথে দেখা হলে ; তার মনটা ভাল থাকে।এভাবে সম্পর্কগুলো হয়ত পরিণতির অপেক্ষায় এগিয়ে যেতে থাকে।

এদিকে নাভিদের মনের খবর রাখার জন্যে ছিল না কেউ ! কেন সে হারিয়ে যেতে দিয়েছিলো মেয়েটিকে ? সেদিন তার মোবাইলটা কি নাভিদের কাছে ভুল করে রেখে যেতে পারতো না ! সিনেমাতে যেমন করে নায়ক-নায়িকার কাকতালীয় ভাবে বারবার দেখা হয়, তার সাথে তেমনটা কি হতে পারতো না ! একটু হলে, কি এমন ক্ষতি হবে ? তবে অচিরেই যে তার আক্ষেপের সম্পাতি রচিত হতে চলেছে, সে কথা কি নাভিদ বুঝেছিলো ?

ডেস্কে রাখা ফাইলগুলো নিয়ে সকাল থেকে নাভিদ ব্যস্ত।নাভিদের বস ইকবাল সাহেব অফিস থেকে বেরোনোর আগে হুট করে তার কেবিনে ঢুকলেন।

– নাভিদ, আমাকে একটু বেরোতে হবে।পরিচয় করিয়ে দেই,উনি হচ্ছেন তরী।আজই নতুন জয়েন করেছেন।ওনাকে সব কাজ বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব কিন্ত তোমার, ঠিক আছে।

ইকবাল সাহেব এবার তরীর দিকে তাকালেন,

– মিস তরী, উনি হচ্ছেন আপনার ইমিডিয়েট বস।কোন সমস্যা হলে ওনাকে বলবেন।তাছাড়া, আমি তো আছিই।

তরী হা- সূচক মাথা নাড়ালো।

চাকরির তেমন কোন ইচ্ছে তরীর কখনোই ছিল না।কিন্ত লেখাপড়া শেষে, বাবা আর ফুপুর বিয়ে কিংবা সংসার নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত আলোচনা থামাতে ; তাকে চাকরির সিদ্ধান্তটা নিতে হয়েছে।

নাভিদ বোধহয় অধিক উত্তেজনায় বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

– হ্যালো, আমি তরী।

নাভিদ কিছু একটা বলার চেষ্টা করলো।তবে তরী কোন জবাব না পেয়ে আবারো বললো,

– হ্যালো।

– আমাকে চিনতে পেরেছেন ?

নাভিদের প্রশ্ন।

– স্যরি, বুঝলাম না।

নাভিদ সেদিনের স্মরণীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলো।

– ও আচ্ছা, আমি সেদিনের ঘটনার জন্য খুব দঃখিত।

মাস খানেক পরের কথা।তরীকে মাঝেমধ্যে কাজের প্রয়োজনে নাভিদের সাহায্য নিতে হয়।তরীর সান্নিধ্যে নাভিদের সংযমী আচরণটা বিনা কারণেই পাল্টে যায়।যদিও, সেটা তরীর কাছে অহেতুক বিরক্ত দান ছাড়া অন্য কিছু বলে সমাদৃত হয় না।

নাভিদের বেহায়া মনটা কিছুতেই তরীর পিছু ছাড়তে চায় না।কখনো অফিস ছুটির পর বাড়ি পৌঁছে দেবার অনুরোধে অথবা, লাঞ্চের বিরতিতে সে থাকতে চায় তরীর একটু কাছে।বিনিময়ে তরীর দিক থেকে অবশ্য সৌজন্যমূলক হাসির পরিবর্তে, অন্যকিছু সে কখনো পায়নি।

তরী নতুন চাকরি নিয়ে ব্যস্ত হলেও, তা বাবুইয়ের সাথে তার মনের সংযোগ স্হাপনে কোনরকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ; কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়নি।কিন্ত, তাতে কি হবে ?! মনের কথাটা আজও দুজনের দিক থেকেই অজানা।তরীও বাবুইয়ের মতো বলতে চেয়েছিলো বহুবার।দ্বিধাগ্রস্হ তরীর সেকথা বোধহয় আর বলা হলো না।

নাভিদ তরীকে জয় করার অভিপ্রায়ে কোন কিছু না ভেবেই উপস্হিত হলো তরীদের বাড়িতে।সেদিন ছিল ছুটির দিন।তাই বাড়িতে তরীর দেখা না পেলেও, বজলুর সাহেবের কাছে সে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলো।বজলুর সাহেব নাভিদের কথা শুনে ভাবলেন, নাভিদ এবং তরী দুজনেই একে অপরকে পছন্দ করে।তাই তিনি নাভিদের অভিভাবকদের সাথে কথা বলতে চাইলেন।পারভিন রহমানও সেদিন ভাইয়ের বাড়িতেই ছিল।নাভিদকে দেখে তার পছন্দ হলো।তাই, তিনি নাভিদের উপস্হিতিতেই তার বাবা- মায়ের সাথে ফোনে আলাপ সেরে পাকা কথা দিয়ে দিলেন।অথচ তরী কোথায় ? তাকে কিছু না জানিয়েই বাড়িতে এসব ঘটে যাচ্ছে !

আর, পারভিন রহমান ভাবছিলেন মেয়েটা হয়ত মুখ ফুটে ফুপুকে মনের কথাটা বলতে পারেনি।

বাড়ি ফিরে তরী পরিস্হিতিকে কি করে সামাল দেবে, তা ভেবে পাচ্ছিলো না।বজলুর রহমান মেয়েকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন।

– কিভাবে তুই যে বড় হয়ে গেলি মা ! তোকে ছাড়া আমি তো থাকতে পারবো না।

তরীর মুখ থেকে একটি কথাও বের হলো না।সুখ কিংবা দুঃখ কোন আবেগই যেন তার হৃদয়কে স্পর্শ করলো না।শুধু রাগ হচ্ছিলো নাভিদের ওপর।কোন উপায় না পেয়ে তরী বাবুইকে সব জানালো।সেই সাথে ভেবেছিলো সব কিছু শোনার পর, অন্নুদীপ্ত বাবুইয়ের অন্তর হয়ত তার নীরবতার অবসান ঘটিয়ে ; তরীর কাছে মনের কথাগুলো ব্যক্ত করবে।কিন্ত বাবুইয়ের অভিনন্দন জ্ঞাপন তার ক্রোধের মাত্রাকে যেন দ্বিগুণ করে দিলো।দিশেহারা তরীর মৌনতাকে বজলুর সাহেব এবং পারভিন রহমান সম্মতি হিসেবেই ধরে নিলেন।

মনের বিরুদ্ধে সংজ্ঘর্ষের আঁচড়ে বাবুই ছিল মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত।তরীকে হারাবার যন্ত্রণা তাকে ক্রোধে উন্মত্ত করে দিলো।তরী যদি তার না-ই হয়, তবে কেন সে অন্য কারো হবে !? এমনটা তো হবার নয়, তবে কেন হতে চলেছে !

প্রচন্ড মাথাব্যথা নিয়ে বাবুইয়ের সমস্ত রাত নির্ঘুম কাটলো।

বেশ কয়েকদিন পরের কথা।

এক বিকেলে হঠাৎ করেই বাবুই তরীদের বাড়িতে উপস্থিত হলো।সেদিন বাড়িতে তরী একা ছিল।এতদিন পর বাবুইকে দেখে তরী একটু অবাক হলো,

– কি তাড়িয়ে দেবে নাকি ?

– পাগোলের মতো কি বলছো এসব !

– না, মানে বাড়িতে তো আজ ফুপুও নেই।আমাকে বসতে দিলে যে ! ভয় করছে না তোমার ?

তরী এবার বাবুইয়ের কাছে গিয়ে বসলো।দুহাত দিয়ে স্পর্শ করলো বাবুইয়ের মুখটা।

– তোমাকে ভয় পাবো ! আমি !

বাবুই ওর হাত সরিয়ে দিলো।

– একটু কফি খাওয়াবে ?

– হুম, আমিও কফির কথা ভাবছিলাম।খুব মাথা ধরেছে।

– তাহলে তুমি বিছানায় কিছুক্ষণ শুয়ে থাকো।আমি কফি নিয়ে আসছি।

– কি যে বলো না, তুমি কেন এসব করবে ?

– এ কথা কেন, আর্কিটেক্ট হয়েছি বলে কি দুকাপ কফিও আমার দ্বারা হবে না।

– আমি কি তা বলেছি ! আচ্ছা যাও।

বাবুই কফি ভর্তি মগ দুটো টেবিলে রেখে তরীর পাশে গিয়ে বসলো।তরী বাবুইকে দেখে উঠে বসলো।বাবুই কিছু না বলেই ওকে জড়িয়ে ধরে।তরীও বাঁধা দিলো না।

– তরী, কেন এমন করলে আমার সাথে ?

তরী জবাবে কিছু না বললেও, তার নয়ননীরে বাবুইয়ের নীল শার্টের বুকের জায়গাটা কিছুটা ভিজে গেল।বাবুই এবার দ্রুতগতিতে তরীর হাতদুটো বেঁধে, ঠোঁটে একটা টেপ আটকে দিলো।তারপর, তরীর মাথাটা একটা মাঝারি আকারের পলিথিনের ভেতর ঢুকিয়ে শক্ত করে

বাঁধলো।সব প্রস্তুতি নিয়েই বাবুই এসেছে।

তরী গোঙানোর সাথে অনেকটা সময় ছটফট করলো।তারপর ওকে নিথর দেখালো।বাবুই তরীকে কোলে তুলে অনেকক্ষণ আদর করলো।তরীর ঘর থেকে বেরোবার সময়, টেবিলের সাথে হোঁচট খেয়ে একটা ডায়েরি হাতে পড়লো বাবুইয়ের।ডায়রিটা বন্ধ করতে গিয়ে দুলাইন তার চোখে পড়লো-

” বাবুই, যদি ভালবাসো তাহলে বলছো না কেন এখনো ? তুমি যদি না আসো তবে, ওই নাভিদের সাথে একটি রাত কাটাবার আগে ; তোমরা কেউ হয়ত আমাকে আর খুঁজে পাবে না। ”

এক বছর পর.....জননী মানুসিক হাসপাতালের পনেরো নাম্বার কেবিনের রোগীর নাম – বাবুই। আজকাল সে কাউকে তেমন একটা চিনতে পারে না।মাঝে মাঝে বিছানার পাশে জানালাটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, আর বলে –

‘ ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে.... ‘

(সমাপ্ত)